Vol. 47 | No. 2 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পালি সাহিত্যে বিবাহ প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা

Volume	47
Issue	2
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Biman Chandra Barua
Published online	February 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i2.6
Pages	109-127
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

পালি সাহিত্যে বিবাহ প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা

বিমান চন্দ্র বড়ুয়া*

ভূমিকা :

পালি সাহিত্যের ইতিহাস সুবিশাল এবং সুবিস্তৃত। ত্রিপিটক ও পরবর্তীকালে রচিত অর্থকথা, টীকা-টিপ্পনী প্রভৃতি এ সাহিত্যের অর্ন্তগত। এক কথায় বলা যায়, ত্রিপিটক হলো পালি সাহিত্যের মূল স্রোতোধারা। পালি সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তায় তৎকালীন বিবাহের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করাই আমাদের লক্ষ্য।

বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি। বিবাহের মাধ্যমে একজন নর ও নারী একত্রে বসবাস করার অধিকার লাভ করে। নারী-পুরুষের পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকা মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। এ থেকেই পরিবার প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। আর এ পরিবার প্রথা থেকে সৃষ্টি হয় বিবাহ প্রথার যা পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করে। উল্লেখ্য, বিবাহের মাধ্যমে পরিবারে উত্তরাধিকারপ্রথা প্রবর্তিত হয় । পালি সাহিত্যেও এ সম্পর্কিত অনেক তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায়।

বিবাহ :

বিবাহ হচ্ছে নারী ও পুরুষের একটি স্থায়ী সম্পর্ক। মাতা-ভগ্নী, জায়া-কন্যা, পিতা-ভ্রাতা এবং স্বামী-পুত্র এ চার রূপের সর্ববিধ সম্পর্কের মূলই হলো বিবাহ[১]। পালি সাহিত্যে বিবাহ পদ্ধতির স্বরূপকে বলা হয় আবাহ বিবাহ[২]। আ+বহ্+ণ যোগে আবাহ যার শব্দগত অর্থ সর্বপ্রথম পুরুষের মিলনের আগ্রহ প্রকাশ। বি+হ্+ণ যোগে বিবাহ যা সুষ্ঠুভাবে নারীর মিলনকে বোঝায়। এখানে নারীর মিলন গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান[৩]। আবাহ-বিবাহের পূর্বে বর কনের করণীয় সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকলেও বিধানুসারে বর কনের সংস্কার[৪] সাধন করা অত্যাবশ্যক বলে অনুমিত। বিবাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে : Marriage is a partnership in which two individuals of opposite sexs but of equal worth as human beings choose to live together.[৫]

---

* সহকারী অধ্যাপক, পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

বিবাহের মাধ্যমে অচেনা-অজানা অপরিচিত দু'জন নর-নারীকে এক সঙ্গে বসবাস করার সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় । তবে এটাও অধিক সত্য যে কুমারী মেয়ের বিবাহকে পরিবার প্রধানরা যেভাবে অধিকতর গুরুত্ব দেয়, পুরুষের ক্ষেত্রে তার ততোটা, দেয় না। S.C.Sarker-এর উক্তির মধ্যেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন: Marriage was her normal inevitable condition.[৬]

প্রাক্ বৌদ্ধযুগে বিবাহ :

বিবাহ সম্পর্কিত প্রচুর তথ্য পাওয়া যায় প্রাক্ বৌদ্ধযুগে। এ সময় অষ্টবিধ উপায়ে পতি নির্বাচন করার উল্লেখ রয়েছে। যথা :

১. ব্রাহ্ম বিবাহ : শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন ও চরিত্রবান পাত্রকে কন্যাপক্ষের আত্মীয় স্বজনেরা আহ্বান করে যথোচিত অভ্যর্থনাপূর্বক কন্যাকে সুচারুরূপে বস্ত্রে আচ্ছাদিত ও অলংকার দ্বারা ভূষিত করে ঐ পাত্রের হাতে যদি কন্যা সম্প্রদান করে, তবে তাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলে। (মনু সংহিতা ৩.২৭)।

২. দৈব বিবাহ : জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ আরম্ভ হলে সেই যজ্ঞে কর্মকর্তা পুরোহিতকে অলঙ্কৃত কন্যাদানই হলো দৈব বিবাহ পদবাচ্য। দৈব কার্যসিদ্ধির কামনায় এ রকম বিবাহ সম্পন্ন হয় বলেই এটাকে দৈব বিবাহ বলে। (মনুসংহিতা ৩.২৮)।

৩. আর্য বিবাহ : ধর্মীয় বিধানুসারে বরের কাছ থেকে একজোড়া গরু অথবা দুই জোড়া গরু নিয়ে ঐ বরকে যে কন্যা দান করা হয়, তাকে আর্য বিবাহ বলে (মনুসংহিতা ৩.২৯)।

৪. প্রাজাপত্য বিবাহ : বরের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করে যথাবিধি অলংকার প্রভৃতির দ্বারা সমাদর করে বরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে। (মনুসংহিতা ৩.৩০)।

৫. আসুর বিবাহ : শাস্ত্র মতে নয়, পরন্তু স্বেচ্ছায় কন্যার পিতা অন্য কোন অভিভাবককে যথাযথ ধন দান এবং কন্যাকে স্ত্রীধনের মাধ্যমে বর কর্তৃক গ্রহণকেই আসুর বিবাহ বলে। (মনুসংহিতা ৩.৩১)।

৬. গান্ধর্ব বিবাহ : বর ও কন্যার পরস্পর অনুরাগবশত যে মিলন বা সংযোগ হয় তাকে গান্ধর্ব বিবাহ বলে। (মনুসংহিতা ৩.৩২)।

৭. রাক্ষস বিবাহ : কন্যাপক্ষের লোকজনদেরকে আঘাত এবং হত্যা করে রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। (মনুসংহিতা ৩.৩৩)।

৮. পৈশাচ বিবাহ : নিদ্রায় অভিভূতা, মদ্যপানের ফলে বিহ্বলা কিংবা অপ্রকৃতিস্থা নারীকে নির্জনে নিয়ে গিয়ে সম্ভোগ করাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। (মনুসংহিতা ৩.৩৪)।

উপর্যুক্ত আট রকম বিবাহের মধ্যে প্রথম চার রকমের বিবাহকে ধর্মীয় বিধান এবং সংস্কার মনে করা হতো ; চুক্তি মনে করা হতো না । বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ এবং অধিকার এ রকম বিবাহগুলোতে ছিল না[৭] ।

পালি সাহিত্যে বিবাহ প্রসঙ্গ :

বৌদ্ধযুগের বিবাহপ্রথা সম্পর্কে জানার একমাত্র উৎস পালি সাহিত্য। এ সাহিত্য ব্যতীত তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত বিবাহ প্রথা সম্পর্কে পাঠোদ্ধার সত্যিই অসম্ভব। পালি সাহিত্যে তিন রকমের[৮] বিবাহ প্রথার উল্লেখ আছে। যথা : ১. স্থিরকৃত বিবাহ ২. স্বয়ম্বর বিবাহ ৩. গান্ধর্ব বিবাহ।

১. স্থিরকৃত বিবাহ : এ রকম বিবাহপ্রথায় বিশেষভাবে বর-কন্যা উভয়পক্ষের অভিভাবক এবং সমাজের সম্মানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সম্মিলিতভাবে বিবাহের জন্য একটি দিন স্থির করতেন। পালি সাহিত্যে বলা হয়েছে, স্থিরকৃত বিবাহের মাধ্যমে এক ব্রাহ্মণ তাঁর চার কন্যাকে একজন সৎ চরিত্রবান ও শীলবান ব্যক্তির হাতে সম্প্রদান করেন[৯]। আরও বলা হয়েছে, কাশীরাজ্যের রাজার ছিল পরম রূপবতী জনপদকল্যাণী লক্ষণসম্পন্না এককন্যা এবং তাঁর ছিল একজন অতিপ্রিয় দরিদ্র কর্মকার। রাজা ঐ কর্মকার পুত্রের সূচীশিল্পের নৈপুণ্য পর্যবেক্ষণ করে তার হাতে তাঁর কন্যাকে সর্মপণ করেন[১০]। তাছাড়া থেরী গাথায় দেখা যায়, ভদ্রা কুণ্ডলকেশা রাজ কোষাধ্যক্ষের গৃহে জন্মগ্রহণ করার পরও পিতামাতার মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে রাজাদেশে দণ্ডিত রাজ পুরোহিতের পুত্র সথুকে গোপনে বিয়ে করেন। কিন্তু কন্যার কারণে পিতা ঐ দণ্ডিত ব্যক্তিকে কন্যা দান করেন[১১]। বাংলাদেশে বাঙালী বৌদ্ধসমাজে স্থিরকৃত বিবাহ দু'ভাবে[১২] সম্পন্ন হয় । যথা :

ক. নামন্ত বিবাহ : যে বিবাহ বরের বাড়িতে সম্পন্ন হয়ে থাকে তাকে নামন্ত বিবাহ বলে।

খ. চলন্ত বিবাহ : যে বিবাহ কনের বাড়িতে নিষ্পন্ন হয়ে থাকে তাকে চলন্ত বিবাহ বলে।

২. স্বয়ম্বর বিবাহ : এ রকম বিবাহপ্রথায় স্ব-স্ব নির্বাচনকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হত। এ প্রথায় পাত্রপাত্রী নির্বাচনের পর ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হতো[১৩]। জাতক সাহিত্যেও এ রকম বিবাহ প্রথার উল্লেখ আছে। কুণাল জাতকে উক্ত আছে, রাজকুমারী কৃষ্ণা তার স্বয়ম্বর সভায় আহূত পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডবকে দেখে মুগ্ধ হন এবং একই সঙ্গে তাদেরকে পতিরূপে গ্রহণ করেন[১৪]। তাছাড়া কলায়ক জাতকেও দেখা যায়, অসুররাজ তাঁর কন্যা সুজাতার জন্য উপযুক্ত পাত্র নির্বাচনের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেন। এ সভায় তাঁর কন্যা সভাস্থ পাণিপ্রার্থীদের মধ্য থেকে পছন্দের ব্যক্তিকে পতিরূপে নির্বাচন করে বরমাল্য অর্পণের মাধ্যমে তাকে বরণ করে নেন[১৫]। আরো উল্লেখ আছে, স্বয়ম্বর সভার মাধ্যমেই কুমার সিদ্ধার্থ দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যা যশোধরাকে বিয়ে করেছিলেন[১৬]।

৩. গান্ধর্ব বিবাহ : এ ধরনের বিবাহ সাধারণত মাবাবার অনুমতি ছাড়া প্রণয়-আবেগবশত শাস্ত্রীয় বিধিবিধান উপেক্ষা করে সামাজিক অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য তারা উভয়ে (নারী-পুরুষ) উভয়কে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে একে অপরকে আপন করে নেয়। এ ধরনের বিবাহের উদাহরণ উজ্জয়িনীরাজ চন্দ্রপ্রদ্যোতের কন্যা বাসুলদত্তা ও কৌশম্বীরাজ উদয়নের বিবাহ। উদয়ন বাসুলদত্তাকে হাতি ধরার মন্ত্র শেখাতে গিয়ে উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েন। এক সময় বাসুলদত্তা গোপনে উদয়নের হাত ধরে পিতৃগৃহ ত্যাগ করে বের হয়ে আসলে উদয়ন বাসুলদত্তাকে বিবাহ করেন এবং রাজমহিষীর পদ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন[১৭]। বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত উদ্যান ভ্রমণে গিয়ে ফলপুষ্প আহরণকারী অপরূপ সুন্দরী জনৈকা রমণীকে গান্ধর্ববিধানে বিবাহ করেন[১৮]। তাছাড়া রাজকোষাধ্যক্ষের গৃহে জন্মগ্রহণ করার পরও পটাচারা মাতাপিতার অনুমতি ছাড়াই প্রণয়জনিত কারণে গৃহ পরিচারকের সঙ্গে পিত্রালয় ত্যাগ করে[১৯]। বুদ্ধ এই ধরনের বিবাহ প্রথাকে গর্হিত এবং নিন্দিত বলে উল্লেখ করেছেন[২০]।

অন্যান্য বিবাহপ্রথা :

উপর্যুক্ত বিবাহপ্রথাদি ছাড়া পালি সাহিত্যে আরও কয়েক রকম বিবাহ প্রথার উল্লেখ আছে যেগুলো সাধারণত অবিশ্বাস্য প্রতীয়মান হয়। যথা : ১. রাক্ষস বিবাহ ২. সহোদর ভাই-বোনের বিবাহ ৩. মাতুল-কন্যা বিবাহ।

১. রাক্ষস বিবাহ : তক্র বিক্রেতার পরম সুন্দরী দুষ্ট কুমারীর রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে জনৈক দস্যু দলপতি বলপূর্বক তাকে নিজের স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে[২১]। তাছাড়া কোশলরাজ

বাহুবলে বলীয়ান হয়ে বারাণসীরাজের অগ্রমহিষীকে নিজের অগ্রমহিষীরূপে গ্রহণ করেন[২২]। কুণাল জাতক পাঠে জানা যায়, কাশীরাজ সেনাশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কোশলরাজ অধিকার করে কোশলারাজের অগ্রমহিষীকে কাশিতে নিয়ে নিজের অগ্রমহিষীরূপে গ্রহণ করেছিলেন[২৩]। এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাহুবলই এ বিবাহের অন্যতম উৎস এবং সে সময় ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছাড়া কারও পক্ষে রাক্ষস বিবাহ সম্ভব ছিল না।

২. সহোদর ভাই-বোনের বিবাহ : এ রকম বিবাহ একটি অভিজাত প্রথা, যা রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রণোদিত এবং কুলমর্যাদাবোধ থেকে উদ্ভূত। কুলের বাইরে বিবাহ হলে রক্তগত বিশুদ্ধি নষ্ট হয়, কুলগৌরব রক্ষা করা যায় না— এরূপ চেতনা থেকে কোন কোন গোষ্ঠীতে ভাই-বোনের বিবাহ আদৃত হয়েছে[২৪]। পালি সাহিত্যেও এরকম বিবাহপ্রথা লক্ষণীয়। আভিজাত্য-গর্বিত রাজকুল একসময় ভাইবোনের বিবাহের ফলে যে বংশের সৃষ্টি হয় পরে সেই বংশই পালি সাহিত্যে শাক্যবংশ নামে খ্যাত[২৫]। আরও উক্ত আছে, রাজা ওক্কাক প্রিয়া মনোহারিণী মহিষীর পুত্রকে রাজ্যের উত্তরাধিকার করার অভিপ্রায়ে জ্যেষ্ঠ কুমারদের (ওক্কামুখ, করকুণ্ড, হক্ষিলক ও সিনিসর) রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে নির্বাসনে পাঠিয়ে ছিলেন। রাজ্য হতে নির্বাসিত হয়ে তাঁরা হিমালয়ের পাদদেশে[২৬] আশ্রয় নিয়ে বসবাস শুরু করেন এবং বংশগত বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে সহোদরার সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন[২৭]। এরকম আপন ভাই-বোনের বিবাহপ্রথার মাধ্যমে লিচ্ছবী রাজবংশের উদ্ভব হয়[২৮]। এ লিচ্ছবীরা যে নগরে বসবাস করতেন তা ক্রমে বিশাল আয়তন ধারণ করে। তাঁদের রাজধানীর নাম রাখা হয় 'বৈশালী'। তাঁরা পুরুষানুক্রমে, বুদ্ধের সময় পর্যন্ত, সাত পুরুষ রাজত্ব করেছিলেন[২৯]। 'মহাবংশ' নামক গ্রন্থে দেখা যায়, সীহ বাহু তাঁর সহোদরা সিহসিবলীকে বিবাহ করেন[৩০]। কাশি যুবরাজ উদয়ভদ্র তাঁর বৈমাত্রেয় বোন উদয়ভদ্রাকে বিবাহ করেন[৩১]। তবে প্রাক্ বৌদ্ধযুগেও আপন ভাই -বোনের বিবাহ প্রচলিত ছিল বলে উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ Sister marriages are rendered of brahama families, it was only exceptional cases of intimate contact with important ruling princes.[৩২] সমাজব্যবস্থায় আপন ভাই-বোনের বিবাহ নিন্দনীয় হলেও প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ভাই-বোনের বিবাহকে রক্তবিশুদ্ধিতার অন্যতম উপায় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

৩. মাতুলকন্যা বিবাহ : প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় এ রকম প্রথা প্রচলিত ছিল। অজাতশত্রু তার মাতুলকন্যা বজ্রকুমারীকে[৩৩], নন্দীয় রেবতীকে[৩৪] এবং পুণ্ডকাভয় তাঁর মাতুলকন্যা সুবর্ণপালিকে[৩৫] বিয়ে করেন। জনৈক মঘ নামক ব্যক্তি তাঁর মাতুল কন্যা সুজাতাকে[৩৬] বিয়ে করেন। মৃদপাণি জাতকেও[৩৭] মাতুলকন্যা বিবাহপ্রথার উল্লেখ আছে ।

তাছাড়া বিভিন্ন জাতক[৩৮] পাঠে আরও জানা যায়, বৌদ্ধযুগে মাতুলকন্যা বিবাহ করার রীতি ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও অপ্রচলিত ছিল না।

৪. বহু বিবাহ : বহু বিবাহ বৌদ্ধযুগেও ছিল। তবে দু'প্রকার বহু বিবাহের[৩৯] উল্লেখ আছে পালি সাহিত্যে। যথা : ১. বহু পতি বিবাহ ২. বহু স্ত্রী বিবাহ।

১. বহু পতি বিবাহ : এ রকম বিবাহ প্রথা দু'রকম। যেমন, ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতি বিবাহ এবং অভ্রাতৃত্বমূলক পতি বিবাহ। পালি সাহিত্যে ভ্রাতৃত্বমূলক পতি গ্রহণের ঘটনা কম। জনৈক নারী একই সাথে একাধিক ভ্রাতৃত্বমূলক পতি গ্রহণ করেন[৪০]। তবে বহুপতি বিবাহে অভ্রাতৃত্বমূলক বিবাহ একেবারে নেই বললেও চলে। তবে বিচ্ছেদজনিত কারণে ইসিদাসী ক্রমে তিনজনকে বিয়ে করেছিলেন[৪১]। এতে ধারণা করা হয়, সংখ্যায় কম হলেও পুরুষের একাধিক পত্নী গ্রহণের পাশাপাশি মেয়েরাও একাধিক পতি গ্রহণের বিবাহে এগিয়ে আসতো। এ বিষয়ে কোন রকম বির্তক পালি সাহিত্যে দেখা যায় না।

২. বহু স্ত্রী বিবাহ : তৎকালীন সময়ে রাজা, রাজপুত্র এবং উচ্চবংশীয় পুরুষেরাই বহু স্ত্রী গ্রহণে এগিয়ে আসতেন। রাজা শুদ্ধোধনও দু'জন নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন[৪২]। তাছাড়া পালি সাহিত্যে বিচ্ছিন্নভাবে রাজা প্রসেনজিতের পাঁচজন স্ত্রীর নামোল্লেখ আছে, যাদের মধ্যে প্রধানা মহিষী ছিলেন মালাকার জ্যেষ্ঠকের কন্যা মল্লিকা[৪৩]। তারা হলেন দু'সহোদরা সোমা ও সকুলা[৪৪], বাসবক্ষত্রিয়া[৪৫] এবং উব্বিরা[৪৬]। তাছাড়া রাজা উদয়নেরও একাধিক[৪৭] স্ত্রী গ্রহণের উল্লেখ পালি সাহিত্যে পাওয়া যায় ; তাঁরা হলেন বাসুলদত্তা, শ্যামাবতী, এ মাগন্দিয়। তাছাড়া অশ্বকরাজ নন্দীসেন কলিঙ্গ রাজার পরম রূপবতী চারকন্যাকে (সহোদরা) নিজের অগ্রমহিষী পদে বরণ করে নিয়েছিলেন[৪৮]। একজন সৎ চরিত্রবান ব্যক্তিও চার সহোদরাকে বিয়ে করেন[৪৯]। 'দীর্ঘ নিকায়' নামক গ্রন্থে একজন ব্যক্তির সমমর্যাদাসম্পন্ন চল্লিশজন স্ত্রীর উল্লেখ আছে[৫০]। অনেক সময় সাধারণ গৃহস্থরা বহু স্ত্রী গ্রহণে এগিয়ে আসতেন। যেমন মগকুমার (মেঘ মানবিক) নামের জনৈক ব্যক্তির চারজন পত্নী ছিল[৫১]। 'ধম্মপদট্‌ঠকথায়' একই পরিবারের তিন ভাইয়ের (চূলকাল-০২ জন, মধ্যমকাল-০৪ জন এবং মহাকাল ০৮ জন) যথাক্রমে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের উল্লেখ আছে[৫২]। এ প্রসঙ্গে সুনীল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা তখন শুধু অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না[৫৩]। রাহ্য জাতক (সংখ্যা-১০৮), কাষ্টহারি জাতক (সংখ্যা-০৭) ও সুজাত জাতকে (সংখ্যা-৩৬) রাজা ব্রাহ্মদত্তের তিনজন পত্নীর উল্লেখ আছে। আবার হরিতমাত জাতক (সংখ্যা-২৩৯) এবং বর্দ্ধকি শুকর জাতক (সংখ্যা-২৮৩) পাঠে জানা যায়, মহাকোশলের কন্যা কোশলদেবী ছিলেন রাজা বিম্বিসারের প্রধানা মহিষী। তাছাড়া থেরী গাথায় উল্লেখ আছে সুন্দরী স্বর্ণবর্ণা ক্ষেমাও রাজা বিম্বিসারের পত্নী[৫৪] ছিলেন। এতে ধারণা করা হয়,

রাজাদের বহুবিবাহের ফলে রাজ অন্তঃপুরে বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্ভব হতো না এবং সাধারণ গৃহস্থদের বহুবিবাহে সচরাচর পারিবারিক কলহ বৃদ্ধি পেতো ।

বালবিবাহ :

বালবিবাহ কোন নিয়মের মধ্যে পড়ে না[৫৫]। তৎকালীন সমাজে অর্থাৎ বৌদ্ধযুগেও বালবিবাহপ্রথার প্রচলন ছিল যা নিম্নবর্ণিত উক্তি থেকে সহজেই অনুমেয় :

হয় নাই জ্ঞানোদয় এমন বয়সে তুমি
পিতৃগৃহ হতে হেথা এলে[৫৬]।

তাছাড়া 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামক গ্রন্থেও[৫৭] বালবিবাহ সম্পর্কিত তথ্য আছে ।

সুতরাং বলা যায়, সে সময় (বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে) বালবিবাহপ্রথার প্রচলন ছিল।

সবর্ণ-অসবর্ণ বিবাহ[৫৮]:

এ ধরনের বিবাহে কোনরকম জাতিভেদ প্রথার স্বীকৃতি নেই। জাতিভেদ প্রথার ফলে সে সময় ভারতীয় জনতার অধিকাংশ তাদের সমাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। বুদ্ধ এ জাতিভেদ[৫৯] প্রথার বিরোধী ছিলেন। বুদ্ধ যেখানে জাতিভেদ প্রথাকে কুঠারাঘাত করেছেন সেখানে সবর্ণ-অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন থাকাটাই স্বাভাবিক এবং তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় পালি সাহিত্যে। জাতকে উল্লেখ আছে, কোশলরাজ প্রসেনজিত জাতিগর্বে গর্বিত না হয়ে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক মালাকারের কন্যা মল্লিকাকে[৬০] এবং দাসীকন্যা বাসবক্ষত্রিয়াকে[৬১] বিবাহ করেছিলেন। 'জাতক' পাঠে আরও জানা যায়, বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত সুন্দরী কাষ্ঠাহরিণীকে বিবাহ করেন[৬২] । 'মধ্যম নিকায়ে' উক্ত আছে, বিবাহের ক্ষেত্রে অনেক সময় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে বিশুদ্ধিনীতি পরিহার করে চলতেন[৬৩]। প্রাক বৌদ্ধযুগে সবর্ণ-অসবর্ণ সম্পর্কে উক্ত আছে, সবর্ণ স্ত্রীর পাণিগ্রহণ বিধিসম্মত। অসবর্ণ বিবাহে স্ত্রীর পাণি গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিই প্রশস্ত[৬৪]। উপরি-উক্ত বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, পালি সাহিত্যে বর্ণিত বিবাহে জাতিভেদ তথা কোন জ্ঞাতি বা জ্ঞাতিত্ব বিচার করা হতো না।

বিধবা বিবাহ :

পালি সাহিত্যে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রয়েছে। ভূরিদত্ত জাতকে দেখা যায়, ব্রহ্মদত্তের পুত্র সর্বাঙ্গসুন্দরী বিধবা নাগা রমনীকে দেখে তার প্রতি মোহাসক্ত হন এবং

পরবর্তীকালে তাকে বিবাহ করেন[৬৫]। রাজা বট্টগামিনী বিধবা অনুলাদেবীকে বিবাহ করেন[৬৬]। এছাড়া উৎসঙ্গ জাতকে[৬৭] জনৈকা রমণীর কাহিনী থেকে জানা যায়, তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। বস্তুত, সে সময় বিধবা বিবাহ নিন্দিত ছিল না।

বিবাহের বয়স :

বিবাহের বয়স ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও পালি সাহিত্যে নারীদের বিবাহের বয়সটাকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জাতকে[৬৮] দেখা যায়, মেয়েরা সাধারণত যৌবনের আগে পিতার-মাতার অধীন থাকে। পুণ্যবতী রমণী শ্রাবস্তীবাসী মল্লিকা[৬৯] এবং মহানাম শাক্যের পরম সুন্দরী সুলক্ষণা কন্যা বাসবক্ষত্রিয়া[৭০] এবং ভদ্রা কুণ্ডলকেশা[৭১] ষোড়শ বৎসর পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। ষোড়শ বৎসর বয়সেই বিশাখার বিবাহ সম্পন্ন হয়[৭২]। বুদ্ধ আবার স্ত্রীদের মধ্যে তরুণী স্ত্রীদেরকেই শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন[৭৩]। তবে পালি সাহিত্যের কোথাও সুনির্দিষ্ট বিবাহের বয়সের কোন উল্লেখ নেই। এ প্রসঙ্গে উক্ত আছে : No age is prescribed as the correct marriageable age, but girls probably married as a rule between the ages of sixteen and twent[৭৪].

এতে প্রতীয়মান হয় যে, সুনির্দিষ্ট করে বিবাহের বয়স উল্লেখ না থাকলেও ষোল কিংবা তদূর্ধ্ব বয়সই বিবাহের বয়স হিসাবে গণ্য করা হতো।

যৌতুক প্রথা :

বৌদ্ধযুগেও যৌতুক প্রথার প্রচলন ছিল। বিশাখার পিতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী তার (বিশাখার) শুভ পরিণয়ে মহালতা প্রসাধন[৭৫] উপহার দিয়েছিলেন যা তৈরিতে ব্যয় হয়েছিল নয় কোটি মুদ্রা[৭৬]। মহাকোশলও রাজা বিম্বিসারের সঙ্গে কন্যার বিবাহের সময় স্নানাগারের ব্যয় নির্বাহার্থে কাশিগ্রাম উপঢৌকন হিসাবে দিয়েছিলেন[৭৭]। যৌতুকের মধ্যে ছিল: It always consisted of jewls and clothes and sometimes also money[৭৮]। যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক অভিশাপের নামান্তর। তবু এ প্রথাকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে স্বাগত জানায় সবাই। পালি সাহিত্যেও এ রকম প্রথার প্রচলনের উল্লেখ রয়েছে । তবে এ প্রথা অভিশাপ নাকি আশীর্বাদ তার কোনও উল্লেখ নেই।

অর্থের বিনিময়ে পাত্রী নির্বাচন :

অর্থের বিনিময়ে পাত্রপক্ষের পাত্রী নির্বাচনের প্রথাসিদ্ধ নিয়মের উল্লেখ আছে পালি সাহিত্যে। 'মিলিন্দ প্রশ্ন'[৭৯] নামক গ্রন্থ জাতক সাহিত্যগ্রন্থেও অর্থের বিনিময়ে পাত্রী

নির্বাচনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত উক্তিটি অর্থের বিনিময়ে পাত্রী সংগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন[৮০] :

লভিতে নারীর প্রেম ধন দিতে চায় যদি নর
প্রলোভন পরিমাণ বাড়ায় সে উত্তর উত্তর
দেবধর্ম কিন্তু তব বিপরীত সম্পূর্ণ ইহার
কমিতেছে প্রতিদিন দিতে চাও যেই উপহার।

তাছাড়া 'ধন দিয়ে ক্রয় করে এনেছে যারে'[৮১] এভাবে পাত্রীপক্ষকে পণ দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে। প্রাক্ বৌদ্ধযুগেও পাত্রীপক্ষের প্রীতিপূর্বক পণ গ্রহণের প্রমাণও দেখা যায়[৮২]। বৌদ্ধযুগে অর্থের বিনিময়ে পাত্রী সংগ্রহ কোনো রকম গর্হিত কাজ ছিল না। সুতরাং অনুমিত হয়, সে সময় অর্থের বিনিময়ে পাত্রী নির্বাচন সমাজ কর্তৃক নিন্দিত ছিল না।

বিবাহ বিচ্ছেদ :

বিবাহ বিচ্ছেদ একটি বিতর্কের বিষয়[৮৩]। পালি সাহিত্যের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। থেরী গাথায় দেখা যায়, ইসিদাসীর তিনবার বিবাহ হয়েছিল এবং তিনবারই স্বামীর পছন্দ না হওয়ায় সে পিত্রালয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল[৮৪]। রহুক নামক এক রাজপুরোহিতের প্রাচীনা নাম্নী অতি নির্লজ্জা ও ধূর্ত স্বভাবা এক ব্রাহ্মণী ছিল যার পরামর্শে এক সময় রাজসভায় পরিহাসের পাত্র হয়েছিলেন রহুক। এতে তিনি উত্তেজিত হয়ে বাড়ী এসে স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেন এবং সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন[৮৫]। বভ্রু জাতকে দেখা যায়, স্বামীর আদেশে যথাসময়ে ফিরে না আসাতে কানা নাম্নী স্ত্রীকে ত্যাগ করে তার স্বামী অন্য জনকে বিয়ে করেন[৮৬]। এ সময় বিবাহ বিচ্ছেদের লিখিত কোনো নমুনা পাওয়া যায় না। বিবাহ বিচ্ছেদ হতো মৌখিকভাবে। স্ত্রী এ নির্দেশকে শিরোধার্য করে দীর্ঘ সংসার জীবনের ইতি টানতেন। তাছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদ না ঘটানোর কারণ হিসাবে বুদ্ধ বৃদ্ধ বয়সে কোনো যুবতী রমণীকে জীবন সঙ্গিনী না করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন[৮৭]। কারণ, তাতে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পালি সাহিত্যে বিবাহ বিচ্ছেদের করণীয় সম্পর্কে তেমন কিছুই উল্লেখ নেই। তবে বৌদ্ধ পণ্ডিত ধর্মানন্দ বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে বলেন : স্বামী ও স্ত্রী যদি বিবাদ, ক্রোধ ও ঘৃণার মধ্যে দুর্দশাপূর্ণ জীবন যাপন করতে থাকে, তা হলে তাদের আলাদা হয়ে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের স্বাধীনতা থাকা উচিত[৮৮]।

বিবাহ্ উৎসব :

বিবাহের আনন্দঘন মুহূর্ত যেন চিরাচরিত সামাজিক প্রথার এক অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। এ উপলক্ষে পরিবারে ও সমাজে নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হতো নানামাত্রিক উৎসব। তবে I.B. Horner এ সম্পর্কে বলেছেন অন্য কথা :

The wedding ceremony was performed without the intervention of a priest and was a purely civil or domestic affair. There was no rites, no vows, no obligation, no savour of superistitions.[৮৯]

বিবাহ নিতান্তই পারিবারিক উৎসব হলেও ক্রমে এ বিবাহ সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়। বিশাখার বিবাহের সময় তার পিতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী কোশলরাজ প্রসেনজিতসহ সকল বরযাত্রীদের স্বাগত জানানোর জন্য মঙ্গলঘট, মঙ্গলবাদ্যসহ বহু লোক পাঠিয়েছিলেন। মঙ্গলবাদ্যের সুতান লহরী, বামা কণ্ঠের উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে তাদের অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল[৯০]। এটা যেন উৎসবের এক নব মাত্রা। বিশাখার এ বিবাহ উৎসব চারমাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল[৯১]। বিবাহ উপলক্ষে বুদ্ধ জনৈক উগগমেণ্ডকনত্তার গৃহে উপস্থিত হয়ে উত্তম খাদ্য ভোজ্য দ্বারা আপ্যায়িত হয়েছিলেন[৯২]। এ-উপলক্ষে বর ও কনে উভয়ের বাড়িতে বৌদ্ধ ভিক্ষু সঙ্ঘকে পিণ্ডদান করা, পঞ্চশীল প্রতিষ্ঠা করা এবং পরিত্রাণ পাঠ শ্রবণ করা আবশ্যক ছিল[৯৩]। সুতরাং I.B. Horner-এর উক্তিটি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। পালি সাহিত্যে বর্ণিত বিবাহ উৎসবে ধর্মীয় আচরণ, পূজা-অর্চনার আয়োজন ছিল তৎকালীন মানুষের নৈমিত্তিক ব্যাপার।

বিবাহোত্তর উপদেশ :

যে কোন যুগের প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি যাই হোক না কেন পত্নী হবে পতির পরমবন্ধু এবং কল্যাণমিত্র। তারা যেন কখনও ভোগ বিলাসিতায় দিবা-রাত্রিকে আবিল করে না রাখে। পরস্পরের কল্যাণ কামনায়, প্রেমের পবিত্রতায়, পতি-পত্নীর সম্পর্ক যেন মধুর হয়ে ওঠে এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি হিত ও মঙ্গল কামনায় যেন মিত্রবান হয়। এ সম্পর্ককে আরও সুমধুর ও গভীর করে তোলার জন্য বুদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর করণীয় সম্পর্কে বলেছেন, পত্নী পতির প্রতি কর্তব্য পালন করবে পাঁচ প্রকারে[৯৪]। যথা :

১. সুচারুরূপে গৃহকর্ম সম্পাদন করা।
২. পরিজন ও অতিথি অভ্যাগতদের প্রতি সর্বদা সম্ভাষণ করা।
৩. নিজ স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা। অর্থাৎ ব্যভিচারিণী না হওয়া।
৪. স্বামীর সঞ্চিত ধন অপচয় না করে তা যথাযথভাবে রক্ষা করা।
৫. সর্বকর্মে দক্ষ ও আলস্যহীন হওয়া।

অনুরূপভাবে বিবাহিত জীবনে পতিও পাঁচ প্রকারে[৯৫] পত্নীর প্রতি কর্তব্য পরিপালনে অধিকতর যত্নবান হবে। যেমন :

১. স্ত্রীর প্রতি সম্মানসূচক বাক্য ব্যবহার করা।
২. কখনও স্ত্রীর প্রতি অশোভন আচরণ না করা।
৩. নিজ পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকা। অর্থাৎ পরদার গমন না করা।
৪. স্ত্রীকে যথাযথ কর্তৃত্ব প্রদান করা।
৫. সাধ্যানুযায়ী স্ত্রীকে বস্ত্রালংকার প্রদান করা।

এখানে উল্লেখ্য যে, নারীরা ঘরের সন্ধানে ঘর ছেড়ে যায়। সেই ঘরে অবস্থানকালে তারা চারটি কারণে[৯৬] সংসার-এর উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। যেমন :

১. স্বামীগৃহে গৃহস্থ কার্যে সুদক্ষা হওয়া, আলস্যপরায়ণ না হওয়া, উচিত-অনুচিত কর্মবিচারে সুনিপুণা হওয়া।
২. দাস-দাসী, কর্মচারীদের কর্মপরিদর্শন করা; তাদের কর্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়েছে কিনা খোঁজ খবর নেয়া; তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান করা ; তাদের শক্তি ও সামর্থ্যনুযায়ী কাজ বন্টন করা; অসুস্থ হলে ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা এবং প্রত্যেককে যথাযথভাবে খাদ্য ভোজ্য বিতরণ করা।
৩. স্বামীর সঞ্চিত ধন-স্বর্ণালংকার রক্ষা করা, ধূর্তা, চোর স্বভাবা না হওয়া এবং সর্বোপরি বিনাশিনী না হওয়া।
৪. স্বামীর মতামত বিরোধী কাজ না করা।

সুন্দর সংসার বির্নিমাণে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা অত্যধিক। পারিবারিক শান্তি উভয়ের সহনশীলতা ও আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল। উভয়ের উভয়কে শ্রদ্ধাচিত্তে সম্মানের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করা নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্যও বটে। তাছাড়া বুদ্ধ মদ্যপানকারী অনর্থক অর্থব্যয়কারী স্ত্রী-স্বামীর পরাজয়ের কথা বলেছেন[৯৭]।

বিবাহের পর মেয়েরা স্বামী গৃহে স্নেহ-মায়া মমতায় সবাইকে আপন করে নেয়। এটাই চিরন্তন নীতি-রীতি। স্বামী গৃহে যাবার সময় ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী তার মেয়ে বিশাখাকে[৯৮] মহামূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন যা নারীসমাজের সাংসারিক উন্নতিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়। সেগুলো হলো :

১. ঘরের আগুন বাইরে নিও না, অর্থাৎ ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ করো না।
২. বাইরের আগুন ঘরে এনো না, অর্থাৎ বাইরের কথা ঘরে প্রকাশ করো না।
৩. যে দিয়ে থাকে, তাকে দিও, অর্থাৎ যে ঋণ নিয়ে ফেরৎ দেয়, তাকে দিও।

৪. যে দেয়না, তাকে দিও না। অর্থাৎ যে ঋণ নিয়ে পুনরায় ফেরৎ দেয় না, তাকে দিও না।

৫. যে দেয় না, তাকে দিও। (যদি কোন দরিদ্র জ্ঞাতি ঋণ নিয়ে তা ফেরত দিতে না পারে; তবু তাকে ঋণ দিও)।

৬. সুখে বসবে। অর্থাৎ এমনস্থানে বসবে যেখানে গুরুজনদের দেখে উঠতে না হয়।

৭. সুখে আহার করবে, অর্থাৎ পরিবারের গুরুজনদের আহারের পর আহার করবে।

৮. সুখে শয়ন করবে, অর্থাৎ শ্বশুর–শ্বাশুড়ী ও স্বামীর শয়নের পর শয়ন করবে।

৯. অগ্নির পরিচর্যা করবে। অর্থাৎ শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, স্বামী ও বড়দের পরিচর্যা করবে।

১০. গৃহে দেবতার ভক্তি করবে। অর্থাৎ পরিবারের গুরুজনদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে।

বহুমাত্রিক গুণে গুণান্বিত হলে নারীরা সংসারধর্মে বিজয়িনী হয়। তাছাড়া সুশৃঙ্খলিক, আদর্শিক এবং সমৃদ্ধিশালী পরিবার গঠনে উপরি-উক্ত উপদেশগুলোর কল্যাণময় কিরণধারা জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জীবনাদর্শে যদি প্রতিফলিত করা যায়, তবে সংসার সুখের হবে এবং পরিবারে ও সমাজে শান্তির নীড় গড়ে উঠবে।

এক সময় বুদ্ধ এক সাধারণ গৃহীর বিবাহোৎসবে উপস্থিত হয়ে নিম্নোক্তরূপ উপদেশ প্রদান করেছিলেন :

> যে বিবাহ বন্ধন ভালোবাসার দু'টি হৃদয়কে গ্রথিত করে, নশ্বর মানবের পক্ষে ঐ বন্ধনটাই চরম সুখ, কিন্তু এটা অপেক্ষাও উচ্চতর সুখ আছে, তা হলো সত্যের আলিঙ্গন। মৃত্যু স্বামী স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে। কিন্তু যে সত্যকে আলিঙ্গন করে মৃত্যু তাকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। সত্যের সঙ্গে পবিত্র বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হয়ে বাস কর। যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগবশত অনন্ত মিলনে আবদ্ধ হবার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে, তাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত হতে হবে। স্ত্রী স্বামীর প্রতি আস্থাবান হয়ে তার সম্মান ও সেবা করবে। স্বামীও স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সম্মান করবে এবং ভরণ-পোষণের যাবতীয় ব্যবস্থা করবে। তবেই বিবাহ বন্ধন পবিত্র ও মঙ্গলময় হবে। তাদের সন্তান-সন্ততিও মাতা-পিতার ন্যায় হয়ে সুখ উৎপাদন করবে[৯৯]।

বৌদ্ধধর্ম মতে নারীকে সদালাপী, মার্জিতা ও বিনয়ী আচরণের অধিকারী হতে হবে। বিবাহ পরবর্তীকালে তাঁদের উভয়ের আচরণকে অধিকতর আকর্ষণীয় এবং গ্রহণীয় করে

তোলা বাঞ্ছনীয়। বিবাহের পর নারীর পারিবারিক আচরণগত দিক সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, She shall :

1. not harbour evil thoughts against her husband ;
2. not be cruel harsh or domineering ;
3. not but spend thriftily but should be economical and live within her means ;
4. guard and save her husband's hard cared earning and property ;
5. always be attentive and chaste in mind and action ;
6. be faithful and harbour no thought of any adulterous acts ;
7. be refined in speech and polite in action ;
8. be kind, industrious and hardworking ;
9. be thoughtful and compassoinate towards her husband ;
10. be modest and respectful ;
11. be cool, calm and understanding --- serving not only as a wife but also as friend and adviser when the need arises[১০০].

স্বামী-স্ত্রী'র বন্ধন সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমময় বন্ধন। এ ক্ষেত্রে উভয়ে উভয়ের সাংসারিক জীবনে বিশ্বস্ত হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। তাছাড়াও স্বামী তার স্ত্রীর কাছ থেকে নিবিষ্টতা, পারিবারিক দায়িত্ব পালন ইত্যাদি আশা করে[১০১]। একই ভাবে স্ত্রীও তার স্বামীর কাছ থেকে বন্ধুসুলভ আচরণ, নিরাপত্তা, ভদ্রতা, বিশ্বস্ততা, সতত উত্তম সঙ্গী মনে করা, নৈতিক সমর্থন ইত্যাদি কামনা করে[১০২]। এক্ষেত্রে মনু'র উপদেশও বিশেষভাবে বিবেচ্য ; যে পরিবারে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট থাকে, নিশ্চয়ই সে কুলে কল্যাণ নিশ্চিতভাবে অবস্থিতি করে[১০৩]।

সুতরাং বলা যায়, পরিবারকে সতত সুন্দরভাবে গঠনের মূলে রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর ঐকান্তিক ভালবাসার সেতুবন্ধন এবং নান্দনিক সমঝোতা যা উভয়ের জীবনে বয়ে নিয়ে আসতে পারে অফুরন্ত ভালবাসা, মায়া-মমতা, সর্বোপরি সফলতা। বিবাহোত্তর জীবনের জন্যে প্রদত্ত উপরি-উক্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশগুলো বৈবাহিক জীবনে অনাবিল শান্তি-সুখের পাথেয় হিসাবে কাজ করবে এমনটি আশা করা যায়।

উপসংহার :

পালি সাহিত্যে কোনরকম সতীদাহ প্রথা, সহমরণ প্রথা এবং নিয়োগ প্রথার (স্বামীর পরিবর্তে কোন নিযুক্ত ব্যক্তিকে সন্তান উৎপাদক হিসাবে গ্রহণ করা) উল্লেখ নেই বললেই

চলে। পালি সাহিত্যে বর্ণিত স্থিরকৃত বিবাহ বাঙালী বৌদ্ধসমাজে এবং স্বয়ম্বর বিবাহ আদিবাসী বৌদ্ধসমাজে এখনো প্রচলিত রয়েছে। গান্ধর্ব বিবাহ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। এ দেশের বৌদ্ধসমাজে অন্যান্য বিবাহ প্রথার মধ্যে মাতুল কন্যা বিবাহের প্রচলন আছে ; তবে রাক্ষস ও সহোদর ভাই-বোনের বিবাহ প্রথা নেই। নেই বহুপতি ও বহুস্ত্রী গ্রহণ প্রথা। সে সময়ের ন্যায় যৌতুক প্রথা ও অর্থের বিনিময়ে পাত্রী সংগ্রহ বর্তমান বৌদ্ধসমাজে কখনও কখনও দেখা গেলেও বর্তমান সমাজে এগুলো বন্ধ করার দাবি উঠেছে অর্থাৎ যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সুধী সজ্জনেরা মত দিচ্ছেন। তবে সেকালের বিবাহের মত এখনো এদেশে বৌদ্ধ বিবাহে উপদেশ প্রদান প্রথার প্রচলন আছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, পালি সাহিত্যে বর্ণিত বিবাহ পদ্ধতিতে প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ বিবাহের ইতিবৃত্ত প্রতিফলিত হয়েছে যার মাধ্যমে তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত বিবাহের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

তথ্য নির্দেশ :

১. বার্ট্রান্ড রাসেল (অনু. নুরুল আনোয়ার খান) বিবাহ-নৈতিকথা, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ ২

২. নূতন চন্দ্র বড়ুয়া, বৌদ্ধবিবাহ ও মন্ত্র ইতিবৃত্ত, চট্টগ্রাম, ১৯৯০, পৃ ১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১

৪. সংস্কার হলো কনের কর্ণচ্ছেদ, ধর্মীয়আচরণ অর্জন করা, বুদ্ধশাসনের উত্তরাধিকার লাভ করার জন্য বরের কিছুদিন প্রব্রাজ্যধর্ম গ্রহণ করা এবং ধর্মীয় আচরণ শিক্ষা গ্রহণ করা।

৫. K. Sri, Dhammananda, Human life and Problems. Kualalumpur, 1997, p. 35

৬. S.C Sarker, Some Aspects of the Earliest Social History of India (Pre Buddhistic Ages), Patna, 1985. p. 127

৭. সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৫৫

৮. ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৩৮৪, পৃ. ৮৭-৮৮। জাতক, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২৬৭, প্রাগুক্ত, জাতক, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৯. ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৪, পৃ. ৮৭-৮৮

১০. জাতক,তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২-১৬৪

১১. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, থেরী গাথা, কলকাতা, ১৩৫৭, পৃ. ৫৮

১২. অতুল সুর, ভারতের বিবাহের ইতিহাস, কলকাতা, ১৪০৭, পৃ. ৭১-৭২

১৩. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

১৪. ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক,পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯১, বাংলা, পৃ. ২৬৭

১৫. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৪ বাংলা, পৃ. ৭১

১৬. Sir Edwin Arnold, The Light of Asia. London. 1964, p. 20-23

১৭. ধম্মপদপট্ঠকথা, উদেনবত্থু

১৮. জাতক, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১৯. থেরী গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২০. Anguttar Nikaya Vol-II. PTS. London. p-167

২১. জাতক, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

২৩. জাতক, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

২৪. নৃপেন্দ্র গোস্বামী, ভারতীয়সমাজ ও বিবাহ, কলকাতা, ১৩৮১, পৃ. ৫১

২৫. ধর্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, চট্টগ্রাম, পৃ. ৭২-৭৩

২৬. ভারতের উত্তর বিহার ও আধুনিক নেপাল রাজ্যের সীমা ।

২৭. দীর্ঘ নিকায়, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

২৮. ধর্মরত্ন মহাস্থবির অনূদিত, মহাপরিনির্বাণ সূত্র, চট্টগ্রাম, ১৯৮১, পৃ. ২৪১ (পরিশিষ্ট)

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

৩০. পুত্তস্স হত্থপাদাসুং সীহাকারা, ততো অকা
নামেন সীহবাহুং তং, ধীতরং সীহসীবলিং।

Wilhelm Geiger, ed, The Mahāvamsa. London. 1958, p. 57.

৩১. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, চতুর্থ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৯১, পৃ. ৭৫

৩২. Some Aspects of the Earliest Social History of India, op.cit. p. 127

৩৩. জাতক, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩

৩৪. Dhammapadāttkhathā vol-1. Pali Text Society, London p. 271

৩৫. Ibid, p. 92

৩৬. Ibid, p 271

৩৭. জাতক, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৩৮. বিভিন্ন জাতক : অসি লক্ষণ জাতক (সংখ্যা-১২৬), নচচ জাতক (সংখ্যা- ৩২) বর্দ্ধকি শূকর জাতক (সংখ্যা-২৮৩), মহাজনক জাতক (সংখ্যা-৫৩৯)

৩৯. ভারতীয় সমাজ ও বিবাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৪০. ১৪ নং পাদটীকা দেখুন

৪১. থেরী গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫৭

৪২. The Mahāvams op.cit. p. 14

৪৩. জাতক, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৪৪. ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ২৫৩

৪৫. জাতক, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

৪৬. থেরী গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৪৭. I.B. Horner, Women Under Primntive Buddhism, Motilal Banarsidas, Delhi, 1999, p. 34

৪৮. জাতক তৃতীয় খণ্ড, ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ. ২-৩

৪৯. ৯ নং পাদটিকা দেখুন

৫০. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৫৪, পৃ. ২১৯

৫১. জাতক, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৫২. ধম্মপদট্ঠকথা, চূলকাল-মহাকাল বত্থু

৫৩. প্রাচীনে ভারতের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৫৪. থেরীগাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৫৫. Some Aspects of the Earliest Social History of India op.cit. p. 91

৫৬. জাতক, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-১০১

৫৭. বিধূশেখর ভট্টাচার্য অনূদিত, মিলিন্দ, পঞহো, বোলপুর, ১৩১৫, কলিকাতা, পৃ. ৯৬ (পুরিসো সুঙ্কং দত্বা বিবাহং করেয্য)।

৫৮. জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বিবেচনা ব্যতিরেকে বিবাহকে সবর্ণ, অসবর্ণ বিবাহ বলা হয়।

৫৯. সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, সূত্র নিপাত, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ-১৭০। বুদ্ধ মতে-জন্ম দ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, জন্ম দ্বারা অব্রাহ্মণ হয় না ; কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ এবং কর্ম দ্বারাই অব্রাহ্মণ হয়। কর্ম দ্বারা কৃষক, শিল্পী বণিক, চাকর, চোর, বুদ্ধিজীবী এবং রাজা হয়।

৬০. পূর্বোক্ত ৪৩ নং পাদটীকা দেখুন

৬১. পূর্বোক্ত ৪৫ নং পাদটীকা দেখুন

৬২. পূর্বোক্ত ১৮ নং পাদটীকা দেখুন

৬৩. মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-১৮৩

৬৪. মনুসংহিতা, ৩, ৪৩

৬৫. ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, জাতক, ষষ্ঠ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৯১, পৃ. ১১৪-১৫

৬৬. The Mahāvamsa. op.cit; p. 270

৬৭. জাতক, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪১

৬৮. বিভিন্ন জাতক : পর্ণিক জাতক (সংখ্যা-১০২), অসি লক্ষণ জাতক (সংখ্যা-১৩৬)

৬৯. ৪৩ নং পাদটীকা দেখুন

৭০. ৪৫ নং পাদটীকা দেখুন

৭১. Women Under Primitive Buddhism, op. cit. p. 28

৭২. Ibid p. 28

৭৩. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, সংযুক্ত-নিকায়, কলকাতা, ১৪০০, পৃ. ৫

৭৪. Women Under Primitive Buddhism, op.cit.p-28

৭৫. মহালতা প্রসাধন-আপাদমস্তক সর্বাঙ্গ পরিবৃত্ত বিচিত্র লতাকর্ম পরিশোধিত বহুমূল্য রত্ন খচিত কারুশিল্প বিমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক ধরনের মহালংকারকে বোঝায়।

৭৬. শীলালংকার মহাস্থবির, বিশাখা, চট্টগ্রাম, ১৯৬৪, পৃ. ৫৩

৭৭. জাতক, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২

৭৮. Women Under Primitive Buddhism. op.cit. p. 28

৭৯. মিলিন্দ পঞ্হো প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৮০. জাতক, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৮১. জাতক, পঞ্চম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৬ (যা চ ভরিযা ধনক্কীতা)। তাছাড়া ৪৫৮ নং জাতকেও দেখা যায়, ভরিযা যাপি ধনেন হোতি কীতা অর্থাৎ ধন দ্বারা পত্নী ক্রয় করা হয়।

৮২. মনুসংহিতা ৩, ৫৩

৮৩. Human life and Problems. op.cit. p-99

৮৪. থেরী গাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫৭

৮৫. জাতক, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

৮৬. জাতক, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

৮৭. সুত্তনিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৮৮. Human life and problems. op.cit. p. 98-99

৮৯. Women Under Primitive Buddhism.op.cit. p -34

৯০. বিশাখা, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৭

৯১. প্রাগুক্ত, পৃ-৪৯-৫৬

৯২. ধর্মতিলক স্থবির সংকলিত, সদ্ধর্ম রত্নাকর, রেঙ্গুন, ১৩৩৬, পৃ. ১৬৭

৯৩. বৌদ্ধ বিবাহ ও ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৯৪. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, দীর্ঘ নিকায়, তৃতীয় খণ্ড, ১৩৬১, পৃ. ১৬৭

৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ-১৬৭

৯৬. সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, বৌদ্ধ মহিয়সী নারী, কলকাতা, ১৪০০, পৃ. ২৮

৯৭. সুত্তনিপাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৯৮. ক. অন্তোগ্গি বহি ন নীহারিতব্বো।

খ. বহি অগ্গি অন্তো না পবেসেতব্বো।

গ. দদন্তস্স এব দাতব্বম।

ঘ. অদদন্তস্স ন দাতব্বম।

ঙ. দদন্তস্সাপি অদদন্তস্সাপি দাতব্বম।

চ. সুখং নিসীদিতব্বম।

ছ. সুখং ভঞ্জিতব্বং।

জ. সুখং নিপজ্জিতব্বং।

ঝ. অগ্গি পরিচরিতব্বো।

ঞ. অন্তোদেবতাপি নমস্সিতব্বা'তি ইদং দসবিধং ওবাদং।

ধম্মপদট্ঠকথা, বিশসাখাবথু।

৯৯. বৌদ্ধ বিবাহ ও ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১০০. Human life and problems. op.cit. p. 46

১০১. Ibid. pp. 47-49

১০২. Ibid. pp. 50-52

১০৩. সন্তুষ্টো ভার্যবা ভর্তা ভত্রা ভার্যা তথৈব চ
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম।
মনুসংহিতা, ৩: ৬২